একটি এককালীন ক্রিকেটপত্র

রাণা রায়চৌধুরী সুস্নাত চৌধুরী অনির্বাণ ভট্টাচার্য অনিমিখ পাত্র
সরোজ দরবার রোহণ ভট্টাচার্য শুভেন্দু দেবনাথ প্রসেনজিৎ দত্ত
সুমন সাধু আকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অর্ণব বসু অভিষেক নন্দী
অরিন্দম মুখোপাধ্যায় অরিত্র সোম রোদ্দুর মিত্র অর্ঘ্যকমল পাত্র অর্পণ গুপ্ত

প্রথম ও একমাত্র প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা ২০২২

কপিরাইট
খেলাপাগল সব লিখিয়ে

নামকরণ
সম্বিত বসু

নামাঙ্কন
সমীরণ

বিপিএল-এর লোগো
প্রশান্ত সরকার

তত্ত্বাবধান
রোদ্দুর মিত্র, অর্পণ গুপ্ত, তন্ময় ভট্টাচার্য ও সম্বিত বসু

বর্ণসংস্থাপন, মুদ্রণ ও প্রচার
আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

দরকার নেই। না-হলেও চলে। তারপরও, অদরকারি কতকিছুই করে ফেলি জীবনে। এও তেমনই এক অদরকারি পুস্তিকা। না পড়লে ক্ষতি নেই, পড়লেও খুব বেশি কিছু পাওয়ার আশা নেই। তবে, বড়োসড়ো কোনো আশা নিয়ে কেই-বা বিকেলবেলায় খেলতে এসেছে! একটু ব্যাট করতে পারা, একটু বল, বাকিটা সময় সুদূর বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং। নয়তো বল কুড়িয়ে আনার মতো অপছন্দের কাজ। খেলতে চাইলে এটুকু তো করতেই হয়! হাতে-পায়ে ছড়ে যাওয়ার দাগ নিয়ে ফিরতে হয় বাড়ি। বকা খেতে হয় বড়োদের কাছে। এ-পুস্তিকার জন্যেও বকা দেবেন কেউ-কেউ। কেউ আবার মুচকি হেসে এগিয়ে দেবেন মলম। আমরা, পরেরদিন শটটা কেমনভাবে খেললে আউট হব না, সেই পরিকল্পনায় ডুব দেব।

এদিকে এমন একটা বয়সে পৌঁছেছি, যেখানে পরেরদিন খেলা আর হয়ে ওঠে না। পরের বছর, উঁহু, তাও নয়। কোনো-একদিন, হয়তো, কখনও— এই স্বপ্ন নিয়েই আটকে রাখি ভেতরের বয়স। আমাদের এই ক্রিকেট খেলার হুজুগও তাই-ই। আগে হয়েছিল বারদুয়েক, এবারও হল। আবার কবে, জানি না। কিন্তু হওয়া ও না-হওয়ার এই স্মৃতিগুলোকে ছাপিয়ে নিলাম। ক্রিকেট খেলার তুলনায় সামান্য ভালো যা পারি।

বিপিএল চলছে, চলবে। কিন্তু, সম্ভবত, আর-কোনোদিন বেরোবে না এই পুস্তিকা। শুরু ও শেষ এতেই। তবু, যারা কবিতা-গদ্য বা অন্যকিছু লেখার চেষ্টা করি, তেমনই কয়েকজন লিখে রাখলাম ক্রিকেট নিয়ে টুকরো-টুকরো কিছু স্মৃতি। দিনশেষে শুধু গায়ে ব্যথা আর আনন্দ।

সাহিত্য থেকে বহুদূরের এই জার্নিতে, পাঠক, আপনিও ব্যাট-বল নিয়ে নেমে পড়ুন আমাদের সঙ্গে।

তন্ময় ভট্টাচার্য

ইডেন কানায় কানায় পূর্ণ

রাণা রায়চৌধুরী

বিপিএল ফের চালু হচ্ছে। বি পি এল মানে, 'বেঙ্গল পোয়েটস লিগ'। আমি রঞ্জিতে তিন বছর আগে ভালো পারফরমেন্স করার দরুন 'বেলঘরিয়া সানরাইজার্স' আমাকে প্রায় তেরো কোটিতে নিলামে নিল, উইকেট কিপার কাম ব্যাটার হিসেবে। নিল তো! তেরো কোটির কিছু টাকা আমার বিদেশের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ ঢুকেও গেছে। কিন্তু ক'দিন ধরে বুকে চকলেট বোমা ফাটছে। বুকের বাঁদিকে একটা গরমে শুকিয়ে যাওয়া ফুটিফাটা ধানখেতের মতো অনিশ্চয়তার ব্যথা!

আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন সৈকত দে। ভালো অফস্পিনার। রাগী! আমাদের টিমের মালিক, দীপিকা পাড়ুকোন ও তন্ময় ভট্টাচার্য। তন্ময় একসময়ে জিম্বাবুয়ের হয়ে টেস্ট খেলেছে।

আমাদের টিমে দুজন সাংঘাতিক পেসার আছে, সম্বিত বোস ও বাংলাদেশের দুর্জয় আশরাফুল ইসলাম। আমার ভয় ওদের দুজনকে নিয়ে। অত পেস, ভয়ঙ্কর পেস বল, আমি উইকেটের পিছনে ধরতে পারলে হয়। হয়তো ক্যাচ উঠল ডানদিকে আমি ঝাঁপালাম বাঁদিকে! তাহলে? খিস্তি আর কাকে বলে। তেরো কোটির কিছু টাকা ফেরত চাইতেও পারে মালিকপক্ষ। টাকা চাইলে অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন আছে।

মালিকপক্ষের কালো হাত গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রচুর লোকও আছে!

চশমা পরে কিপিং করতে কাউকে দেখিনি। একমাত্র দিলীপ দোশিকে দেখেছি চশমা পরে স্পিন বল করতে। কিন্তু আমি তো চশমা ছাড়া অত জোরে বল দেখতে পারব না। ফলত,

পাড়ার সেন্টুকে বলেছি কাল থেকে প্র্যাকটিসে আসতে। ভালো জোরে বল করে সেন্টু। ও অবশ্য জানে না তেরো কোটির গল্প বা বিপিএলের কথা। আমি চেপে গেছি। ওর কাছে ক'দিন প্র্যাকটিস নেব।

ভেবেছিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসটা আবার পড়ব, কিন্তু টাকার লোভে বঙ্কিমচন্দ্র আপাতত স্থগিত।

বেলঘরিয়া সানরাইজার্স!

টিম মালিক দীপিকা পাড়ুকোন, কাল গেহরিয়াঁ দেখলাম। ভালো খেলতেই হবে। বিপিএল-এ শুনছি চিয়ার লিডাররাও থাকবে। থাকুক। আমার পাখির চোখ থাকবে পেসারদের বলের দিকে।

ক্রমে আলোর সঙ্গে একটু-একটু রঙিন অন্ধকারও আসিতেছে।

ইডেন কানায় কানায় পূর্ণ!

ইডেন ক্রিকেটভরা বাগান যেন!

লতিফের অদৃষ্ট ও দৃষ্ট

সুস্নাত চৌধুরী

মানুষের মৃত্যু হলে থেকে যায় মানব যখন, তখনই তার নামের আগে 'লেট' বসে। তবে কি না, সে-লেট এ-লেট নয়। কাটলেট আর লেট কাটে যা ফারাক, এদের তফাতও খানিক সেরকম। এরা সকলেই তেমন দেরিদা, যারা মেলার মাঠে নয়, খেলার মাঠে হাজির থাকে। ভারী কিংবা হালকা লেটে। লতিফের কথাই ধরুন। না, পাক কিপার রশিদ লতিফের কথা বলছি না। বলছি লেট-লতিফের কথা। ইশকুলের অঙ্ক স্যার থেকে আপিসের বস তো বটেই, মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে এলেও আপনি খেয়াল করবেন যে, এঁদের মুখে এই লেট-লতিফের নাম ঢের শুনেছেন। কিন্তু ক্যাজ লুকে আর আয়নার সামনে দাঁড়ানো হয় না বলে লতিফের সঙ্গে আপনার কখনো দেখা হয়নি। এমতাবস্থায় বুকে (নিজের) হাত রেখে ভাবুন, দেখবেন বিলক্ষণ চেনা চেনা ঠেকছে। মনে পড়ে যাবে সেসব দিনগুলোর কথা, যেসব সোনালি বিকেলে আরেকটু আগে বাড়িতে ম্যানেজ করে বেরোতে পারেননি বলে টিমে জায়গা পাননি। হলে সিট পাননি। আর, শেষমেশ, বিকেল ফেলে রেখে সোনালিও অন্যের সাইকেলে উঠে চলে গিয়েছে।

তবে কি না, লেট হওয়া কারো অদৃষ্টের লিখন, কারো দৃষ্টের। মানে, দেখতে দেখতে দেরি। তা ছেলে কিংবা মেয়েই হোক, অথবা প্রুফ। এইসব চক্কর থেকে বাঁচার কোনোই পথ নেই; অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার লেট হওয়া সময়ের পরিমাণ এক চক্কর পূর্ণ করছে। কাজেই, দেরি করতেই হলে বেশি দেরি করুন— গোটা একটা দিন, গোটা একটা বছর কিংবা গোটা একটা জীবনই। তবেই আপনি সময়ের চোখে পাংচুয়াল হয়ে উঠতে পারবেন। উপযুক্ত লতিফ হতে পেরে গর্বও বোধ করবেন।

একদিন সব হবে

অনির্বাণ ভট্টাচার্য

তারপর স্যার কোনান ডয়েল, পি জি উডহাউস, এইচ জি ওয়েলস, জেরোম কে জেরোম, জি কে চেস্টারটনদের নিয়ে জে এম ব্যারি বানালেন ক্রিকেট টিম, আল্লাহআকবরিস। 'অল চিল্ড্রেন, এক্সেপ্ট ওয়ান, গ্রো আপ'। সেই যে বড়ো হলাম, আর খেলা হল না। লেফটি বলে কি? গলির ভেতরে বাড়ি, নব্বইয়ের রোয়াক, ওই মেয়েটির শরীরের তিল, লাবডুব লাবডুব— সব বাঁদিক ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। বুকের ব্যথায় বন্ধু বসে গেলে আমি ছায়ার সঙ্গে শ্যাডো প্র্যাকটিস করলাম। ছায়ার ভেতরেই দেখতে পেলাম পরজন্ম পেরিয়ে সাইডলাইনে বসে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে বন্ধু। বলছে, খেলব, আমি খেলব। আমাদের যাদের এক এক করে অনেকগুলো খেলব খেলব বছর পেরিয়ে আর খেলা হল না, তারা ওদের ঢাল করি। বলি, তোকে তো দেখতে পাচ্ছে না কেউ, সামনে ঘোর। বল, কটা আঙুল ধরলাম, ক'নম্বরে ব্যাট। ও এক বললেই আমি জোচ্চুরি করে আরও চারটে আঙুল খুলে জোর করে পাঁচে নামি। খেললেই হল নাকি, আউটের ভয় নেই? প্রথম বলেই? তার চেয়ে এই ভালো। দূর থেকে সেফ জোনে থেকে ফিল্ডিং। বলি, জন্টি চাইত, সব বল ওর কাছে আসুক। বল এলেই দূরে সরে গিয়ে বলি আসুক, আসুক শালা বল। তারপর ফিল হিউজের হেলমেট আর রমন লাম্বার ফিল্ডিং পোজিশন শাফল করে সাজিয়ে নিই ঘুঁটি, দেখি এক এক করে মায়াকবিতা, মুক্তগদ্য, দেওয়াল পত্রিকার সম্পাদকীয় পেরিয়ে লারউডের পেসের চেয়েও জোরে পা চালিয়ে ফিরছে বন্ধু। সামনে পোয়েটস লিগের মাঠ, লাস্ট ম্যানের ব্যাটিং থাকা নান্দনিক পিচ।

আর খিদ্দা বলছেন, 'সব পারে, মানুষ সব পারে'...

ক্যাচ ও কবিতা

অনিমিখ পাত্র

কবিতা লেখার সঙ্গে যৌবনের একটা যোগ আছে— কবি গৌতম বসু বিশ্বাস করতেন। লেখাকে উল্টে দিলেই হয় খেলা। মানে সবুজ মাঠ। ঘাসের যৌবন। রৌদ্রের গন্ধ। ছায়ার শিশির। ব্যাটসম্যান কিংবা বোলার নন, ঘাসের সঙ্গে নিবিড়তম গেরস্থালি একজন ফিল্ডারের। তার ক্রিয়া আসলে খুব প্রতিক্রিয়াশীল।

ব্যাটধারীর মুখের সামনে দাঁড়াই, ক্লোজ ইন, অপেক্ষা করি। ডাইভ যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা প্রথম পংক্তির মতো নিরুপম। তীব্র রিফ্লেক্সে যদি হাত নড়ে চকিতে আর জমে যায় অসম্ভব ক্যাচ! বাশো-র হাইকুসম কবজির মোচড়ে করা দৃষ্টিনন্দন ফ্লিক কিংবা শক্তি চাটুজ্জের মতো ছন্দোময় কভার ড্রাইভঃ। ধারাভাষ্যকার বলেন, সবুজ ঘাসের বুক চিরে ছুটে গেল একটি কবিতা! কবিতার সে মায়াকাননে ফিল্ডিং এর প্রবেশাধিকারের দাবি জানালাম।

বিপিএল ২০১৭— একটি ডাইভ আমার ডানপায়ের স্বাভাবিকতাকে কেড়ে নিয়ে গেল। ঘাসের ওপর, ব্যাটারের সামনে, ওঁত পেতে দাঁড়িয়ে অনভ্যাস ও বুড়ো হাড়ের কথা খেয়াল ছিল না। সফট টিস্যু ছিঁড়ে গেল বটে, তবু, প্রাণময় সেই ক্যাচ ধরতে পেরেছিলাম। হয়তো শিল্প মানে অপেক্ষাই। কী খেলায়, কী লেখায়, কী জীবনে। ক্যাচ উঠবেই। আর একসময় খেলাও ঘুরবে।

আম্পায়ারোচিত

সরোজ দরবার

আম্পায়ার যেন বিধাতার সুলভ সংস্করণ। আঙুলের ইশারায় তার নড়ে যায় পৃথিবী। সে খেলে না, তার অনুশাসনে খেলে যায় গোটা পাড়া। চাট্টিখানি কথা! এ মোড়লকে গাঁয়ে মানে, তার নির্বাচন গণতান্ত্রিক। যে-সে হালে পানি পায় না। উঁহু, ক্রিকেটের জ্ঞান বড় কথা নয়! টিভির ভিতরও কত আম্পায়ার ভুল করে। পাড়া ক্রিকেট সে-ই আম্পায়ার, স্বাধীনতা দিবসে শহিদ স্মরণে রক্তদানে যে এগিয়ে গিয়েছিল সবার আগে। পাড়ার প্রেস্টিজ বাঁচায় যে, তার মহিমা নশ্বর ব্যাট-বল স্পর্শের অধিক! তারই চেতনার রঙে বাউন্ডারি তাই হয় ওভার বাউন্ডারি। হেনকালে উদাসীন বাড়ির পূবের ছাদে কে যেন ফোনে একা একা কথা বলে ঘুরে ঘুরে! তার আলতো সালোয়ারে মহাপুরুষেরও মন গিয়ে পড়ে আর নো বলে ফুস হয়ে যায় কারোর ক্রিজে টিকে থাকার আয়ু। তবু সেইসব আম্পায়ারের কাছে, ভরসা রাখা আছে। পাড়া ক্রিকেটের কোনো স্থির সংবিধান নেই। আম্পায়ার স্বয়ং আইনপ্রণেতা এবং রায়দানকারী। তারপর জীবন চলে যায় কুড়ি কুড়ি ওভারের পারে। এইসব বিচ্ছিরি বাঁচার সেলফি ছুঁয়ে একদিন কারোর দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে— হাউজ দ্যাট! উত্তর মেলে না, হিসাবও।

গলিসভ্যতা

রোহণ ভট্টাচার্য

পাড়া ক্রিকেট। সব উইকেট কাল্পনিক। ইটের টুকরো বা পুরনো চপ্পল; দু-পাশে চেতানো, মাঝে চিচিং ফাঁক। আম্পায়ার হৃদয়বান হলে, ইটের ফাঁক মহাশূন্যসম। দুই চটির মাঝে গলে যায় আসমুদ্রবিকেল। উইকেট নেই তবু বোল্ড। আবার বোল্ডের জন্যেও নাকি করতে হবে আপিল! এমন খেলায় আমরা 'ব্যাকরণ মানি না'। সোজা আঙুলে যেমন ঘি ওঠে না, তেমনই সোজা ব্যাটে ওঠে না রান। অগত্যা আড়া চালাই। চাপ্টি মারি। ব্যকরণ শিং থেকে হয়ে উঠি রামতাড়ু। তাড়ু বলে দুয়ো দিলে আমাদের ইগোয় লাগে না, প্রেস্টিজেও না। আমাদের কেবল কানায় লাগে, হ্যান্ডেলে লাগে। কখনও লাগে দুই পায়ের মাঝে, ব্যক্তি-স্বাধীনতায়।

হাতে কাজ না থাকলে, থাকে ব্যাট। গলিতে এসে দেখি, পৌরনিগম আমাদের পিচ খুঁড়ে তুলে এনেছে গলিসভ্যতার ভূগোল-ইতিহাস। বল ইতিহাসের গায়ে ড্রপ খেয়ে অফস্পিন। কখনও বোমার মতো আছড়ে পড়ে মানচিত্রে। আমাদের ব্যাটও তো কোদালপ্রতিম। লাগলে ছয়। না লাগলে ট্রাই-বল। মাঝে মাঝে ট্রাই-ওভার। তবু ওয়াক-ওভার নয়। যদি শেষ বলে চাই ছয়-সাত, তবে নো-বলে ছয়। যদি চাই বারো বা তেরো, তবে পরপর নো-বল। ফসকালে আউট নেই। আম্পায়ার ঠিক ওয়াইড ডেকে দেবে। তাড়ুদের ঈশ্বর নেই, আম্পায়ার আছে।

ব্যকরণের দোহাই দিয়ে যারা বলে আনাড়ি, তারা বেরসিক। কেবলই সুনীতিকুমার পড়েছে। আমাদের সিলেবাস ঠাসঠাসদ্রুমদ্রাম। ইয়র্কার বলে ছয় কিংবা কুনুই দিয়ে চার। রামতাড়ু কবেই বা ব্যকরণের প্রফেসর হতে চায়? তার ভালো নাম যে প্রফেসর হিজিবিজবিজ। অন্তমিলের চেয়ে গোঁজামিলেই ভরসা বেশি। আমরা তো সেই কবে থেকেই জানি, যুদ্ধ-ফুদ্ধ হয়ে একদিন এই পৃথিবীটা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। সব জল গড়িয়ে ডাঙায় চলে আসবে। প্যাচপ্যাচে কাদায় আছাড় খেয়ে পড়বে লোকজন। তখন ঢ্যাবঢ্যাবে গলিতে বল নেমে যাবে হাঁটুর নিচে। ব্যাকরণের গুডবয়রা আউট হবে। কেবল আমরাই আনকা মেরে নটআউট থেকে যাব। আর বেদম হাসব। সাথে আছে আম্পায়ার, হবে ছয়।

খিস্তি-অভিধান

শুভেন্দু দেবনাথ

ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা এবং অস্ট্রেলিয়া আর স্লেজিং একে অপরের পরিপূরক, জন্ম ইস্তক তাই শুনে এসেছি। কিন্তু এ দুই খেলার প্রবাদের স্রষ্টা সম্ভবত আমাদের, অর্থাৎ আমরা যারা '৮০-৯০এর গলি ক্রিকেটের খেলোয়াড়, তাদের চিনতেন না। তাহলে ভদ্রলোকের খেলা শব্দটা কোনোদিনই ব্যবহার হত না। আমাদের ব্যাট বল উইকেট ছিল না। ছিল তিনটে কঞ্চির উইকেট, নারকেল গাছের পাতার পেছন দিকের শক্ত অংশের ব্যাট অথবা একটা শক্ত মত কাঠকে ব্যাটের আদল দেওয়া। আর বল বলতে ঠেসে কাগজের উপর গুচ্ছের রবার ব্যান্ড বাঁধা।

কেউ একজন ব্যাট করছে, অমনি উইকেটের পেছন থেকে আওয়াজ আসত বোলারের উদ্দেশ্যে, 'ওর মাঝের ছোটো উইকেটটা ভেঙে দে, নেতিয়ে গেছে।' কিংবা উইকেটকিপার চেঁচিয়ে উঠত, 'দে বল করে টল (বিচি) ফাটিয়ে।' আশা করি, মাঝের ছোটো উইকেটটা যে কী, তা আলাদা করে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

এ তো আলুভাতে খিস্তি। ব্যাটসম্যানকে ঘিরে ধরে চারদিক থেকে একের পর এক বাছা বাছা বিশেষণ ভেসে আসত, যা শুনলে আইসিসির কোড অফ কন্ড্যাক্টের নিয়মকানুনগুলি লজ্জায় মুখ লুকোত। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন আমি ব্যাট করছি, লাল্টু বল করছে। এবার চারদিক থেকে আওয়াজ আসতে শুরু করল, 'বালের ব্যাটসম্যান, বালের ব্যাটসম্যান, বলটা জাস্ট অফ স্ট্যাম্পে রাখ, ওর বিচির ফাঁক গলে ডান্ডা ফাটিয়ে দেবে।' আবার কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'বল ডান্ডায় রাখ, কিচ্ছু করতে পারবে না, আমরা জিতে যাব, গাঁড়ে নেই দম খাবে চমচম, দে ওর চমচম ফাটিয়ে।' ১০ বলে ১২ রান বাকি, নতুন ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে এসেছে, ক্লোজ ইনের ফিল্ডার চেঁচিয়ে উঠল, 'এঃ বালের ব্যাটসম্যান এসেছে আমার, বাপের পোঁদে চুল নেই ছেলের গাঁড়ে চাপদাড়ি, সকলেই কি আর শচীন হয়, যে জিতিয়ে দেবে!' খেলার খিস্তি নিয়ে লিখলে এ লেখা মহাভারত হতে বাধ্য। আর এমন সব অভিনব বিশেষণ যে এই মাঝবয়সে সেসব লিখতে গেলে হাত কাঁপে এখনও এবং মনের ভেতরের শিশুটা এমন অট্টহাস্য করে ওঠে যে লেখা-টেখা মাথায়।

জোচ্চুরিকাল
প্রসেনজিৎ দত্ত

দশের লাঠি একের বোঝা নয় বরং উল্টোটা। একজনই লাঠি ঘোরানোর কাজে সিদ্ধহস্ত। সে যেন এফবিআই এজেন্টের মতো। সূক্ষ্ম কাজে পটু। অথচ কেউই ধরতে পারছে না। সেই এজেন্ট হাতে লাঠি থুড়ি এক পিস উইকেট নিয়ে আর কেউ নয়— নন-স্ট্রাইকার এন্ডের ব্যাটার। সে-ই আম্পায়ার। উইকেটের প্রান্ত বদল হলেও তাই। ক্রিকেট চলত 'চুরি'র ফাঁদপাতা গলিজুড়ে ছায়াপথ নেমে এলে। সমবয়সিরা নয় শুধু, কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি বড়ো হয়ে যাওয়া ছেলেপিলেরাও খেলবে। সবচেয়ে ষণ্ডামার্কা দুই ক্যাপ্টেনের একজন টসের জন্য খুচরো না পেয়ে কুড়িয়ে নেয় ইটের টুকরো। বিশেষ এক কায়দায় চোখের সামনে হাত ঘুরিয়ে তার সটান প্রশ্ন, 'আছে কি নেই?' ঠিক উত্তর দেওয়া মানেই টস জেতা। এরই মধ্যে পরিষ্কার আউট। রানারআপ আম্পায়ারের চোখে ওটা নো-বল। ইল্লি? ছলের শিকার হওয়া দলের ক্যাপ্টেন তখন যেন রণতুঙ্গা। তার সেনাপতিরা নো-বলের প্রতিবাদে নো-গেমের ধুয়ো তুলে অভিমানী। ঝঞ্ঝাট যখন মধ্যগগনে, অদৃশ্য জাদুবলে খোদ রণতুঙ্গারও রণে ভঙ্গ। শোধবোধ ঘোড়ার পোঁ... করে খেলা হবে খেলা হবে। তারপর যে-কে-সে। ছয় বলের জায়গায় আট বলে ওভার! কিংবা যে রান গোনে, সে কখনও রানও বাড়িয়ে দিতেও নিঃসংকোচ। অগত্যা সেসব হিসাব নিখুঁত রাখতে প্রতি বলের শেষে শেষে চিৎকার করে কাউন্টিং— 'পাঁচ বল শেষে ৮ রান'। আপন পাঁজি কেই-বা পরকে দিতে চায়!

ওদের হাতে ব্যাট, আমার হাতে ঝালমুড়ির ঠোঙা

সুমন সাধু

মাঠে গিয়েছি পিঠ বাঁচিয়ে। কোনো বল এসে যদি গায়ে লাগে! কেমন ভয়-ভয় ভাব। এই পিঠ বাঁচানো স্বভাবটা এখনও গেল না। খেলা দেখা আর মাঠে গিয়ে খেলার মধ্যে তফাৎ আছে। কিন্তু তফাতের সংজ্ঞা আমার জানা নেই। কারণ এ দুটির মধ্যে কোনোটিতেই আমি পড়ি না। রামকৃষ্ণ মিশনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। ক্রিকেট বিশ্বকাপ দেখানো হবে বড়ো অডিটোরিয়ামে। রাতের খাওয়ার সময় সেদিন তাই এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখলাম, বন্ধুদের কারোর খাওয়ার মন নেই। দলে দলে সবাই অডিটোরিয়াম-মুখী। আমাকেও যেতে হয়েছিল বাধ্যত। ভারতের মান রাখতে। যদিও ভারতীয় দলের প্রথম ছক্কায় আমার পক্ষ থেকে হাততালিটা এসেছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। পরবর্তীতে যাদবপুরের মাঠে বিকেল-গুলোয় ক্লাস শেষে বাংলা বিভাগের অনেকেই মাঠমুখী হত। আমিও হতাম। ওদের হাতে থাকত ব্যাট। আমার হাতে ঝালমুড়ির ঠোঙা।

এভাবে দিন গেল। স্বভাব গেল না। এই একটি বিষয়ে কারোর সঙ্গে কোনোদিন তর্কে-আড্ডায় অংশগ্রহণ করিনি। এতে ব্যর্থতা নেই। আফসোস আছে। এই আফসোস হয়তো একদিন শূলে চড়াবে। করোনাকালীন বন্দিজীবনে চৌহদ্দিতে থাকতে থাকতে স্মৃতিতে ফিরে ফিরে এসেছে আমার রামকৃষ্ণ মিশনের মাঠ, যাদবপুরের মাঠ, শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। যেখানে মাঝেমধ্যে আমার দায়িত্ব থাকত খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি আর চকোলেট তুলে দেওয়া। স্মৃতি আঙুল তুলে দেখিয়েছে মাঠ কোনোদিন আমার হয়নি, আমিও মাঠের হতে পারিনি।

ধুলোখেলা

আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

মধ্যবিত্ত বাড়ির দেওয়ালে যদি ইটের রঙে তিনটে মাথাকাটা লম্বা দাগ না থাকে, আমরা তাদের অন্য নজরে দেখি। সে বাড়ি দুই ভাই বা এক ভাই-বোন অথবা দুই বোনের আংশিক আধিপত্যে থাকলেও, যে জায়গার বাটোয়ারা হয় না তা উঠোন। কোনও এক অজ্ঞাত মায়ায় মানুষ টুকরো করতে ভয় পায় উঠোন, আর এই উঠোন জুড়েই চলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্রিকেট, যারা জানে না বাবার সঙ্গে জ্যেঠুর বা পিসির কী সমস্যা...
ঠাকুরদা চলে যাওয়ার পর শুনেছি আলাদা হয় আমাদের সংসার। হাঁড়ি আলাদা হয় একান্নবর্তীর, একই ছাতের তলায় দুটি রান্নাঘর, দুটি বারান্দা, পৃথক সংসার আর একটিই ক্রিকেট পিচ। বাবা কাকা চেয়েছিল কোনো সমস্যা যেন না পৌঁছায় আমাদের মধ্যে। মিলেমিশে থাকি আমরা...
মা বারান্দা থেকে ডাকছে, সন্ধে হয়ে আসছে, আর একটা ম্যাচ বড়োজোর। আমার পিঠ চাপড়ে দাদা জানতে চাইছে কত নম্বরে ব্যাটিং, আমরা দুটো আলাদা দলের ক্যাপ্টেন, কেউ কাউকে রান করতে দেব না, অতীতের এই যৌথ উঠোনে।

মদীয় ক্রিকেট

অর্ণব বসু

ময়দান এক আশ্চর্য জায়গা। ক্রিকেটের কথা বলতে গেলে ময়দান এক অসীম ক্ষেত্র যার কোনো বাউন্ডারি নেই। স্লিপের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বল, মাটি ঘেঁষে প্রথম প্রেমের মতো। আঙুলের স্পর্শে ব্যথা হল খুব, কিন্তু বল অধরাই থেকে গেল। স্লো টার্নার, ধীরে ধীরে নেশা ধরে পিচে। ময়দান বলতে নানা ধরনের উইকেট আর আউট না-হওয়ার ফিকির। জুতোয় বল লাগলে নো বল, পাড়া থেকে উঠে আসা অনন্তকালের নিয়ম ময়দানেও প্রযোজ্য। ময়দানের ক্রিকেটে উইকেটে বেল লাগানো একধরনের বিলাসিতা, তাই আমাদের আউট হওয়া ছিল আলো নিভে আসার মত দ্রুত ও নিষ্পত্তিবিহীন। কারও কারও বল যেন অক্ষরবৃত্তের মতো, মিডলঅর্ডারে ধরে খেলতে হয়। সহজ ছড়ার মতো সুর কেটে বোলারের সঙ্গে পরকিয়া করছে কেউ কেউ, এই বুঝি হাতের তালুতে বেমক্কা ধরা পড়ে যাবে। আম্পায়ারের মুখে বিকেলের সস্তা আলো, তেরছা, যেন দুশোটাকার একটা রামের পাইট গিলে মাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। ওয়াইড বলের দাগটুকুই যেন মাঠের একমাত্র কলঙ্ক, ভেসে আম্পায়ারের ইচ্ছেমতো দৃশ্যমান হয় আবার মুছেও যায় নিয়মমাফিক। ময়দানের ক্রিকেটে শেষতম ম্যাচ সবচেয়ে মজার, যে টিমের কাছে আলোর ভাগ বেশি, তার জয় নিশ্চিত! ক্রিকেটের কাছে কবিতার ধার কতখানি, তা ময়দানে গেলে টের পাওয়া যায়, দূরের বলকে যতই দূরে ফেলা হোক না কেন, কেউ না কেউ তাকে কুড়িয়ে নেবেই...

দ্রাবিড় সহায়!

অভিষেক নন্দী

পাড়ার মাঠ থেকে গলি, যত জায়গাতেই ছোটো থেকে ক্রিকেট খেলেছি, একটাই সমস্যা ছিল— পাশে একটা বাড়ি থাকতই, যার সীমানায় বল ঢুকলে সেই বাড়ির জ্যেঠু/জ্যেঠিমা বল আর দিতেন না; উল্টে ভীষণ তিরস্কার করতেন; তাছাড়া জানলার কাচ থেকে ফুলের টব ভাঙা তো ছিলই। লোকের কাছে বকা বা কেস খেতে আমার মোটেই ভালো লাগত না বলে, অন্যদের মতো সেওয়াগ, সৌরভ, শচীনের ফ্যান হয়ে ছক্কা না-হাঁকিয়ে, বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেকে দ্রাবিড়ের ফ্যান হিসেবে ঘোষণা করে, টুকটুক করে খেলে যেতাম। বল আনা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে বকা না-খেতে হয়, সেজন্য এই পলিটিক্স! ভাগ্যিস দ্রাবিড় ছিলেন সেসময়! লোকটা দিনের শেষে শুধু টিমকেই বাঁচাননি, আমার মতো ভীতুর ডিমকেও অতদূর থেকে বাঁচিয়ে গ্যাছেন দিনের-পর-দিন!

টস-টসে

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

পাড়ার খেলাতে দলভাগ অনেকটা পরীক্ষার আগে প্রিপারেশানের মতো। ঠিকঠাক না হলে, খেলা শুরুর আগেই শেষ। টিম করে খেলা সময়, কে কার দলে থাকবে সেই নিয়ে তুমুল বাওয়াল। কারোর সঙ্গে কারোর আগে থেকেই আঁটসাঁট। এক টিম ছাড়া খেলবে না। তো কেউ আবার এক টিমে দিলে খেলবে না। দল নির্বাচনের সময় প্রায়শই সবাইকে একটা করে নাম্বার বলে দেওয়া হত। তারপর দুজন ক্যাপ্টেন সিলেক্ট করে তার পিঠে লটারি। যে যে নাম্বার ঠিক বলতে বলতে পারে, সেই নিয়ে দল। বাকিরা অন্য টিম। একেবারে জগাখিচুড়ি হয়ে গেলে, নিজেদের শাফল করে ঠিক করে নেওয়া। বন্ধুত্ব। ম্যানেজমেন্ট। খেলা শুরুর আগে দরকার টস। আমরা টস করতাম মাঠে পড়ে থাকা শিখরের প্যাকেট দিয়ে। তার একদিকে নাম হিন্দিতে লেখা, অন্যদিকে ইংলিশে। হেড, টেলের সস্তার সাপ্লিমেন্ট আর কী। উইকেট হত কখনও ইট পরপর বসিয়ে, আর তা না-পাওয়া গেলে, হাওয়াই চটি ছিল সম্বল।

আমরা আবার মাঝেমাঝে পার্টনারশিপেও খেলতাম। কোনো টিম নয়। যতজন আছে, ততগুলো নাম্বার লিখে ব্যাট দিয়ে চেপে ধরা। যে যেটা সিলেক্ট করবে সে সেই নম্বর। এবার ১/২ একসঙ্গে ব্যাট করতে নামবে। বাকিরা ফিল্ডিং। এদের কেউ আউট হলে ৩ নামবে তারপর ৪। এইভাবে। এদের মধ্যে যাদের পার্টনারশিপ সবচেয়ে বেশি হবে তারা চ্যাম্পিয়ন। তবে এসব পেরিয়ে সব থেকে মজা হত গ্রাউন্ডে ম্যাচ খেলার সময়। নো ছক্কা। অনলি চার। ছয় আর আউট এক হয়ে যেত তখন। লোভনীয় হাফ ভলি তখন বোলারের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। নামার আগে তাই আমার গুরুকে স্মরণ করে নিতাম। ডিফেন্স। কন্ট্রোল। রাহুল দ্রাবিড়। মনে মনে আউড়ে নিয়ে লেগে পড়তাম কাজে। দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে কীভাবে যে হঠাৎ সন্ধে নেমে আসত, বুঝতেই পারতুম না তখন!

চশমাটা খসে গেলে

অরিত্র সোম

দত্তবাবু ঠিকই বুঝেছিলেন। কিন্তু বদ্যিপাড়ার মন্টুর কখনও ঠ্যাং ভাঙেনি, রঞ্জনাও বেপাড়ায় পা রাখেনি। কিন্তু চশমার দুঃখ এভাবে 'মরমে পশিল গিয়া'... এর আগে হয়নি। আপাতত মন্টুর নাক, রক্ত-সর্দির ব্লাডি মেরি ককটেল তৈরির কারখানা। দুটো দাঁত মায়ের ভোগে, আর আরেকটা দাঁত বাবা মেরে নাড়িয়ে দিয়েছে। চশমা থাকলেও মন্টুর এখন সবই ঝাপসা। ক্রিকেট মানে তাহলে সত্যিই ঝিঁঝিঁ...

টিউশনে প্রথমবার চশমা পরে যাওয়ার পর উল্টোদিকের মেয়েটি বারবার তাকাচ্ছিল। ঘামাচি ততদিনে বসন্তকে গদিছাড়া করেছে; কিন্তু... হু হু বাওয়া! তবে কী কুক্ষণে যে মাঠে গিয়েছিল! দিব্যি ব্যাট ফ্যাট নিয়ে দাঁড়িয়েছে; ক্রিজেও বারতিনেক ঠুক ঠুক করেছে। কয়েক বল খেলার পরেই, চোখের সামনে সমুদ্র! ঘামের জোয়ারে চশমার প্রাণ আঁইঢাই। কোনোরকমে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে দাঁড়াল; অমনি ধপাস! সন্ধে হওয়ার আগেই মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠল... টাইগার পতৌদি সত্যিই বড়ো ক্রিকেটার ছিলেন।

আর শনিঠাকুরও বোধহয় হাই পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে মন্টুকেই দেখছিলেন। ফিল্ডিংয়ে দুটো ক্যাচ ধরে মন্টু আয়রন ম্যান। তৃতীয় ক্যাচ ধরার আগেই সপাটে বল লাগল মুখে। আবহাওয়া সূত্রে খবর, তার আগে রাস্তাঘাট ঝাপসা ছিল। কাচ পরিষ্কার সবেমাত্র শুরু হয়েছিল, ততক্ষণে...

আপাতত ভেত্তোরি আর হ্যারি পটারের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে মন্টু। সমস্যা একটাই, টিউশনে উল্টোদিকের বেঞ্চে তাকাবে কী করে! নতুন চশমা না হয় তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে, কিন্তু নতুন দাঁত তো...

খোয়া খোয়া চাঁদ

রোদ্দুর মিত্র

এবং পাড়ায় রটে গেল, আমি হারিয়ে গিয়েছি। অনন্ত এক পাকুড়গাছের নীচে— পাঁকজলে— জলকাঁকড়া-শামুক-তেচোকো মাছের মহল্লায়। তখনও আলো নিভে আসেনি। যারা অন্তুর প্রতিপক্ষ, এই সুযোগে হ্যাঁচকা টান মেরে মেরে নামিয়ে দিতে চাইছিল আস্ত সন্ধেটাকে। একবার সন্ধে নামলে অন্তু হেরে যাবে। পাঁচ বলে বারো রান। অন্তু খোঁড়াচ্ছে। পেরেকটা শালা আজকেই ফুটল!

পাঁচিলের ওপার থেকে— কতগুলো সমবয়সি, অসমবয়সি দূরবিন এতক্ষণ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। অথচ আমার যে হারিয়ে যাওয়ার একশোরকম ফিকির আছে, তা কি ওরা জানে না? তিতিবিরক্ত হয়ে অন্তু লাফ দিল এপারে। এখন আমি আর অন্তু দশপায়ের সন্তর্পণ দূরত্বে। দূরত্ব কমে সাত-পা, আরও কমে যখন তিনপায়ে এসে ঠেকল, চোখাচুখি হল আমাদের—উৎকণ্ঠায় হাত-পা ছুঁড়তে না পেরে আরও গেঁথে দিলাম নিজেকে। হারিয়ে গেলাম আরও। আলো নিভে এল খানিকটা। পাতাল থেকে ডাকছি, তবুও কি অন্তু সাড়া দেবে না আর?

হতে চেয়েছিলাম একটা আকাশ পেরনো ছয়। কাঁচ ভেঙে ঢুকে পড়তে চেয়েছিলাম তিন্নির ঘরে। ড্রপ খেতে খেতে খেতে বলতে চেয়েছিলাম কত কথা— অন্তুর, আমার, আমাদের... কেন যে পাঁকজল ঠেলে উঠে আসতে পারছি না! কেন যে চাঁদের মতো অস্তিত্বের আলো বিলিয়ে দিতে পারছি না— আমার সবুজ, লোমশ, ক্যাম্বিসের আলো!

এখনও সময় হয়নি?

অর্ঘ্যকমল পাত্র

বয়সে ছোটো, তাই মাঠের ধারে বল কুড়োতাম। আম্পায়ার দাঁড়াতাম। প্র্যাক্টিসে চুটিয়ে হাত ঘোরাতাম। ম্যাচে খেলত কাকু-জেঠু-বদ্দা গোছের লোকেরা। এভাবেই একদিন হঠাৎ সুযোগ এল। প্লেয়ারাভাবে। 'এখনও ৬ ওভার বাকি। উইকেট দিবি না।' সেই তখন থেকেই আমি বল ছেড়ে চলেছি। বহুদিন হল।

আজ, হঠাৎ, এসব মনে পড়ছে। কিছুটা ওভার বাকি আছে। উইকেট দিলে চলবে না! শর্ট বল আসবেই। ততক্ষণ, অপেক্ষায়, একের পর এক বেরিয়ে যাচ্ছে— গুড লেন্থ, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, টেস্টপেপার, কোভিড, একের পর এক বান্ধবী এবং সেমিস্টারে আটকে যাওয়া এই বিপিএল দু-হাজার বাইশ। অপেক্ষা করছি, জানি, পরের বছর নিশ্চয়ই একটা শর্ট বল বা সামনের পায়ের বল আসবে। আর কভার অঞ্চল থেকে ছুটে আসবে মৃদু দুটো হাততালি। ঠিক যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে চারবছর আগে আমি আর বাংলা কবিতা বল কুড়িয়ে দিতাম, বাউন্ডারির বাইরে বল এলে...

পলাশ ফোটার শব্দ অথবা ম্যাচ-রিপোর্টিং

অর্পণ গুপ্ত

আটচল্লিশ রান। মাঝে অচেনা কাঁকর। রোদ্দুর খোঁড়াচ্ছে। রোদ্দুর জ্বলজ্বল করছে আকাশে। আমরা ঘামছি। জাঁদরেল সম্পাদকের 'বাঁয়ে হাত কা খেল' দেখে ব্যোমকে গেছে পাঠক। ছিটকে গেছে মিডল স্টাম্প। ঘাস, নুড়ি, ভবঘুরে। প্রহরে প্রহরে খেলা শুরু। তন্ময়দা বনাম অর্ণব। ঠুকঠুক। খুটখাট। দুই-চার। পৃথ্বী শান্ত, ইউক্রেন-রাশিয়া সামলে নিয়েও আপাত শান্ত, বরং ব্যাটিং স্টান্স জমাট। বাইরে দ্রাবিড়, ভেতরে ভেতরে অজয় জাদেজা। পাঞ্জাবি থেকে ওয়াইডের দাগের দূরত্ব কম। মিডল অর্ডার সুস্নাতদার বোধ আকাশে, শব্দ হাতে। তার মানে ক্যাচ আউট! লেখকের অন্তিম পরিণতি বোধহয় ক্যাচ আউট। এদিকে আমরা জানি, এবং মানি, যাদের কেউ নেই, তাদের ওয়াইড বল আছে। বেকারের সম্বল খুচরো, আর আনাড়ির সম্বল ওয়াইডে এক রান; জুড়ে জুড়ে কখন তেইশ পেরোল। শুভেন্দুদা ব্যাট ঘোরায় কয়েকবার, আকাশ পেরনো ছক্কাদের আমরা খেলতে নিইনি। তাই মাঝে মাঝে ক্রিজ থেকে তুলে নিচ্ছে ব্যাটসম্যান। আটচল্লিশ রান করতে হবে, জয়ন্তারা বলে নেমে পড়েছে ইন্দ্রনীল তেওয়ারি। অনিমিখ পাত্র আসবে। ওর হাতে ব্যাট নেই। হাতুড়ি আছে। অনিমিখদা জানলা সারাই করে। ঠিক কতটা আলো এলে ঘুলঘুলিকে জানলা বলে অনিমিখদা? আলো আর ধুলোকে আলাদা করতে গিয়ে কিছু দূর এগোলাম। তোমার সঙ্গে। আমার ক্যাচ উঠে গেছে। তোমার চাউনি। আকাশে। শুভেন্দুদার হাতে জমা। অরিত্র-র চশমার কাচ ঝাপসা। ভেত্তোরির মতো সরল মুখে চেয়ে আছে। কয়েক ওভার বল পেলে ছিটকে দেবে স্টাম্প। অভিষেক খুঁজছে। হাসি। বিকেলের গায়ে। অফের বাইরে ড্রপ খেয়ে কিছু আগে মিডল স্টাম্পে ঢুকেছে ক্যাম্বিস। ময়দান থেকে লিটিলম্যাগ মেলায় আমরা যাব। এভাবে। খানিক পর। তার আগে ম্যাচ জিতিয়ে অনিমিখদা ব্যাট না তুলে, মাথা নিচু করেই মিটিমিটি হাসে। রেলগাড়ি স্টেশনে নামিয়ে আবার একটা জার্নি শুরু করবে। আবার খেলা। আমরা যেভাবে আকাশ দেখি, আকাশ সেভাবে দেখে খেলা। দূর থেকে। হাঁ করে। মেঘ

ছেঁড়া রোদ নামে ময়দানে। পরের ম্যাচে চলে যাচ্ছে টলটলে জীবন। সম্পাদক বোল্ড! নো-বল... না বল। 'না' বলা জরুরি সম্পাদনায়। প্রথম বলেও। এলেবেলে বল বলতাম আমরা। পচা শামুকে পা! অরিত্র পেয়েছে উইকেট। রসদ। অনিমিখদা আরেকটু পর। রোদ্দুর। বিকেলের মতো নরম ক্যাচ। রোদ্দুর পড়ে আসছে। পড়ে আসছে একবছরের অপেক্ষা। চিরায়ত নামখানা চমৎকার। থেকে যায়, থেকে যায়, স্কোরবোর্ডে। নাম। রান। সোজা আঙুলে ফেলা ডেলিভারি। বসে যায় নুড়ির আঁচড়ে। চিরায়ত মানে বোধহয় বিকেলের মনখারাপ। কোনোদিন ছেড়ে যায় না। আমাকে ধরে থাকতে হবে। কোনোমতে। টিকে। ঠুকে। অনিমিখ পাত্র একাই পাঁচটা পনেরোর মাঝবিকেল। একাই নন্দনের ছোটোকাগজ। দু-ছক্কা পাঁচে এসে ব্রেক কষে, মাটি থেকে তুলতে গিয়েও গড়ানে ড্রাইভ মারে। মাপজোপ করা। এবার বোর্ডে বাহান্ন। শুভেন্দুদার ম্যাচ একাই জিতিয়ে দিচ্ছে অনিন্দ্য। সুন্দর। চক্রবর্তী কুলসম্ভব। ক্রিকেটকুলও বটে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা অলীক হলেও ব্যাট দিয়ে ফিটনেস ঢাকা আমাদের শিখিয়েছেন ইনজামাম। অনিন্দ্যদাও। চার ছক্কা ইরিকিরি। অন্তর বোল্ড। ফিল্ডার কাছে। শেষ ক'বলে ২ রান। মিড-উইকেটে সোজা শট। ম্যাচ পকেটে। শুভেন্দু-তন্ময় ১-১। এক্কা এক্কা!

শেষ ম্যাচে আমাদের বিকেল আরও বড়ো। আরও কত পা। সোহমদার দৌড়। ভুল ডাক। আউট হয়ে গেল বসন্তকাল। কে এই বসন্তকাল? যে এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল? বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, থুড়ি শনিবারে। যেন বই-এর ভেতর বুকমার্ক। অনিন্দ্যদা আউট। ফাইন লেগে অব্যর্থ ক্যাচ। ম্যাচ পকেটে সম্পাদকের। অনিমিখদাকে বল ছুঁড়ছে ও। আগুপিছু করে খেলছে। বাউন্ডারি বের করছে। ডিঙি পার করে দিচ্ছে শীতের শেষ রোদ। ম্যাচ জিতে গেছি আমরা। সব্বাই। ২-১ আমাদের পকেটে। ছবি-জল-লেমনেড-হাত-পা-ব্যথা-নন্দন হাঁটি হাঁটি। ভবঘুরে বসন্ত আর নেই। চলে গেছে। নতুন মাঠের খোঁজে। ব্যাট নেই। বল নেই। দল নেই। শুধু আছে কিছু রং। তাড়ুয়া শট। গোটানো প্যান্ট। ছেঁড়া জামা। যে-কোনো প্যালেটে পড়ে পাকাপাকি থেকে যাবে ছবিতে। গড়ের মাঠে এমন ভবঘুরে আজীবন বসে থাকে। চুপ করে। অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতার পাশে উবু হয়ে বসে থাকে আমাদের শৈশব-কৈশোর। অপেক্ষা করে নতুন ম্যাচ শুরুর। ঠিক ভিড়ে যাবে। ভিড়ে যাবে শীতের পিছু পিছু। হয়ত আমাদেরই সঙ্গে। অজান্তে আমরা পেরিয়ে যাব ময়দান, আমাদের ব্যাটে-বলে হলেই তখন পলাশ ফোটার শব্দ...

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

মূল্য : ২০ টাকা